প্রথম আলো

তারিখ ... 10 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ■ মতিউর রহমান, তুহিন ওয়াদুদ, আপেল মাহমুদ, আশরাফুল আলম

আর কত দুর্নীতি করলে উপাচার্যকে অপসারণ?

'এটি একটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে ২০ অক্টোবর ২০০৯ সালে একটি খবর *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত হয়। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মু. আবদুল জলিল মিয়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ৬ মে ২০০৯ সালে। মাত্র চার মাসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশি পরিমাণ আত্মীয়স্বজন নিয়োগ দিয়েছিলেন যে সেটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে পড়েছিল। সরকার তখন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের নির্লিপ্ত থাকার সুযোগ নিয়ে তিনি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের বহর। ১৬ কোটি মানুষের রাজস্বে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের একক স্বেচ্ছাচারিতার এক অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছেন এখানকার উপাচার্য। পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, দেশে কোনো আইনের শাসন নেই। উপাচার্য কী পরিমাণ দুর্নীতি করেছেন, তা এখন সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে গঠন করা তদন্ত কমিটি তদন্ত করে উপাচার্যের দুর্নীতির যে বাস্তব চিত্র পেয়েছে, সেটাকে তদন্ত কমিটি 'অভূতপূর্ব' বলে উল্লেখ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যেহেতু নির্বাহী ক্ষমতা সংরক্ষণ করে না, তাই তারা উপাচার্যকে অপসারণের সুপারিশ করে তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ৪ এপ্রিল ২০১৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় তাঁর দুর্নীতির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁকে সেখানে তলব করা হয়েছিল। সেখানেও তাঁকে অপসারণ করাসহ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। মু. আবদুল জলিল মিয়া আইন-নিয়ম-রীতি—কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। তিনি রীতি না মেনে তাঁর আত্মীয়স্বজনের নিয়োগ বোর্ডে সভাপতিত্ব করেছেন। অমান্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বেশ কয়েকটি ধারা-উপধারা। তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তা-ও তিনি অনুসরণ করেন না। ২৮ জানুয়ারি থেকে তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা স্থগিত করার পর তিনি আগের তারিখে কয়েক শ নিয়োগ সম্পন্ন করেছেন।

মঞ্জুরি কমিশনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ২৯ মার্চ তিনি সিন্ডিকেটের ৩০তম সভার ৩ নম্বর আলোচ্যসূচিতে আবার নিয়োগ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তখন সিন্ডিকেটের বিজ্ঞ কয়েকজন সদস্য নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করলে তিনি নিয়োগের বিষয়টি অনুমোদন করতে ব্যর্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ৩ এপ্রিল পুনরায় একটি চিঠি দিয়ে তাদের নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করে।

> বিশ্ববিদ্যালয়-মঞ্জুরি কমিশন তাঁকে অপসারণের সুপারিশ করেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী সভায় তাঁকে অপসারণ করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি নেওয়ার সুপারিশ করেছে। তার পরও সেই উপাচার্য স্বপদে বহাল আছেন! কী অদ্ভুত এই দেশ!

উপাচার্য যেহেতু সংসদ থেকে পাসকৃত আইন মানেন না, মঞ্জুরি কমিশন মানেন না, মন্ত্রণালয় মানেন না, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মানেন না, তাই তিনি স্থায়ী কমিটির সভা থেকে ফিরে এসে আবারও নিয়োগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা কত, তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। ব্যাংক ব্যবস্থাপককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, উপাচার্যের বলতে নিষেধ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখায় জিজ্ঞাসা করলেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। উপাচার্য তাঁর আপন ভাই হিসাবরক্ষক ও ভায়রাকে দিয়ে হিসাব শাখার গোপনীয়তা বজায় রেখে চলেছেন।

দুর্নীতিপরায়ণ একজন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনার মুখে কালো কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার কি একবারও ভেবেছে, এই একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কোন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন খাতে গ্রহণ করা সব টাকাই অননুমোদিত পদে নিয়োগ দেওয়া জনবলের বেতন-ভাতা দিতেই তিনি শেষ করেছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উত্তর জনপদের। আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের কায়িক পরিশ্রমের ঘামে আয় করা অর্থ অনেক কষ্টে অভিভাবকেরা দিয়ে থাকেন। সেই টাকা কি অননুমোদিত পদে নিয়োগকৃতদের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জমানো ভবিষ্য তহবিলের টাকা তুলে বেতন দিয়েছেন। এই উপাচার্য যখন চলে যাবেন এবং নতুন যে উপাচার্য আসবেন, তিনি কীভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় চালাবেন?

৩ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে দেওয়া পত্রে বলা হয়েছে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যে অনুমোদিত নিয়োগ দিয়েছেন, সেই পদের অনুমোদন এবং তাঁদের বেতন-ভাতা কখনোই মঞ্জুরি কমিশন প্রদান করবে না। অননুমোদিত পদে নিয়োগকৃত জনবল এখন প্রায় সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ জন। এই বিশালসংখ্যক জনবলের বেতন-ভাতা বন্ধ হলে তাঁদের পরিবারের কী অবস্থা হবে, উপাচার্য কি একবারও ভেবে দেখেছেন? যাঁরা চাকরি করতে এসেছেন, তাঁদের কি উপাচার্য এখন পর্যন্ত বলেছেন যে তাঁদের বেতন-ভাতা মঞ্জুরি কমিশন প্রদান করবে না! জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতো যেন কোনো বিপর্যয় এখানে না নেমে আসে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। সরকার যদি উপাচার্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তাঁর বহির্গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের ১৬ কোটি মানুষের। তিনি এককভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সীমাহীন স্থায়ী সমস্যা সৃষ্টি করে যেতে পারেন না।

মু. আবদুল জলিল মিয়ার ন্যূনতম আত্মসম্মানবোধ নেই। তা না হলে একজন উপাচার্য হিসেবে কী করে এত অন্যায় করেন! দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চের ব্যানারে তাঁকে অপসারণের জন্য সচেতন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। স্থানীয় সুশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি বরাবর। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাঁকে অপসারণের সুপারিশ করেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী সভায় তাঁকে অপসারণ করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তি নেওয়ার সুপারিশ করেছে। এর পরও সেই উপাচার্য স্বপদে বহাল আছেন! কী অদ্ভুত এই দেশ!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি জনসভায় রংপুরের উন্নয়ন নিজ হাতে তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই বিবেচনায় এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর দায়িত্ব, প্রথমত, বড় দায়িত্ব তাঁরই।

● লেখকেরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।